ভূমিকা

লেখক ও পাঠকের মনের অভিলাষ পূর্ণ করতে বাংলা সাহিত্যের সৃজন ও অনুশীলন চলে আসছে আবহমান কাল ধরে। কালের পটে কত স্রষ্টা তাঁদের সৃষ্টির সম্ভার উদাহরণস্বরূপ দিয়ে গেছেন। এই সম্ভারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি আজও চলছে এবং চলতে থাকবে সৃষ্টির দান। বাংলা সাহিত্যাকাশে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (২৪শে অক্টোবর, ১৮৯৪ – ৩০শে জুলাই ১৯৮৭) একটি অমর নাম। বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে শুরু করে এই শতকের আশির দশক পর্যন্ত এক দীর্ঘ ও বিস্তৃত সময়কাল ধরে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় লেখালেখি করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যের বিচিত্র সম্ভার পাঠকের মনের অভিলাষ চিরকাল পূর্ণ করতে থাকবে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ের আগে বাংলা ছোটগল্পের পূর্ব ইতিহাস ও তার গতিধারা সম্পর্কে বলা বিশেষ জরুরী। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বে বাংলা ছোটগল্পের শাখা কোন্ কোন্ সাহিত্যিক-এর দ্বারা কেমন বৈশিষ্ট্যে ও কীরূপ খাতে প্রবাহিত তার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত টানা বিশেষ জরুরী।

বাংলা ছোটগল্পের যাত্রার সূত্রপাত প্রাচ্যের হাত ধরে নয়। আর পাঁচটা সাহিত্য প্রকরণের মতো ছোটগল্পের যাত্রাও শুরু হয়েছে পাশ্চাত্যের হাত ধরে। কয়েক শতাব্দীব্যাপী চলা বাংলা সাহিত্য পদ্য-বন্ধ থেকে মুক্তি পেয়ে আশ্রয় নেয় গদ্যের, মূলত ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বদান্যতায়। তবে সেটা ছিল বাংলা গদ্যের উত্থান ও গঠন সঠিক করার সময়। সার্থক ছোটগল্পের পরিচয় আরো অনেক কাল পরের কথা। যদি উপন্যাসের কথা ধরি তাহলে তার সার্থক প্রথম শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলা যায়। সনেট, মহাকাব্য, নাটকের স্রষ্টার নাম যায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার জনক বিহারীলাল চক্রবর্তীর দিকে। তবে আগের দু-চারটি রচনায় ছোটগল্পের কিছু লক্ষণ থাকলেও সার্থক বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক ছোটগল্পকার তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ঋণী। ‘ভারতী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ‘ভিখারিণী’, ‘করুণা’, ‘ঘাটের কথা’ গল্প তিনটি প্রথমে প্রকাশিত হলেও সার্থক ছোটগল্পের সূত্রপাত ‘হিতবাদী’ পত্রিকার ‘দেনাপাওনা’ গল্প থেকে। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে লেখা ‘দেনাপাওনা’ থেকে শুরু করে ১৩৬২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘মুসলমানীর গল্প’ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী চিন্তার ধারা জগৎ ও জীবনের নানা মাত্রাকে স্পর্শ করেছে। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিককে তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের গল্পের ধরণ সব সময়

এক রকম থাকেনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা বাঁক বদল করেছে। রবীন্দ্র-গল্পের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিগুলি অনায়াসেই লক্ষ করা যায় সেগুলি বহু বিচিত্র। কখনও তাঁর গল্প কাব্যময়, আবার কখনও গীতধর্মী; কখনও বা প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনকে উন্নীত করে এক রোমান্টিক বাতাবরণ তৈরি করে চলেছে। তাঁর ছোটগল্পে বিভিন্ন স্থানে বাংলার পল্লীজীবন ও মানব মনের বিচিত্র অভিব্যক্তির প্রকাশ নানা ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ গল্পে এসেছে স্বদেশ-প্রেম, সমাজের নানা সমস্যা, রাজনীতির স্পর্শ, তো কখনও নারীর স্বাধিকার রক্ষা ও প্রতিবাদের কাহিনী। শুধু এসবই নয়, তাঁর গল্পে কখনও এসেছে নরনারীর প্রেম-মনস্তত্ত্ব আবার কখনও এসেছে অতিপ্রাকৃতের ছোঁয়া। তবে কবিগুরুর মানব প্রেমের পূজারী সুলভ মনোভাব সকল পাঠককে চিরকাল মুগ্ধ করে যাবে।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে এবং অব্যবহিত আগে ও পরে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম, রাজশেখর বসু, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই বাংলা ছোটগল্পের নিজেদের সৃষ্টির সম্ভার রেখেছেন। এঁদের মধ্যে যে চারটি উজ্জ্বল নক্ষত্র চিরকাল তাঁদের আলোক বিচ্ছুরণ করে যাবেন তাঁরা হলেন – ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার, পরশুরাম ও শরৎচন্দ্র। আপন বৈশিষ্ট্য ও লেখনির গুণে এনাদের গল্প অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। এই সময় বাংলা গল্পে কৌতুক-বিদ্রূপের একটি বিশেষ ধারা এবং কাহিনীতে ব্যঙ্গের উপস্থিতি প্রবাহিত হয়েছিল। এই ধারার মুখপাত্র ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরও দুজন হলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু। প্রভাতকুমারের গল্পে হাসির উপাদান থাকলেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পরিমাণ তেমন নেই। অপরদিকে সমাজের প্রতি বিদ্রূপে পাঠকের মধ্যে হাস্যরসের জোয়ার এনে দিয়েছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। এই সাহিত্য ধারাটিতে পরবর্তী কালে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা পান বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

হাস্যরস ধারার পূর্বোক্ত তিন ছোটগল্পকার তাঁদের কল্পনাবলে ও পর্যবেক্ষণ গুণে যেসব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেগুলির জনপ্রিয়তা চিরকালীন। তাঁদের গল্পের বর্ণনাভঙ্গি ও প্রদর্শন কৌশলের মাধ্যমে যে চরিত্রগুলো সৃষ্টি হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে অমর। ত্রৈলোক্যের ডমরুধর, সুবলচন্দ্র গড়গড়ি, লম্বোদর, গোলক চক্রবর্তী ; প্রভাতকুমারের রসময়ী, কাশীবাসিনী, বলবান জামাতা ; পরশুরামের বংশলোচনের পশুপ্রীতি, কচি সংসদের সাংসদদের কীর্তি, হনুমানের স্বপ্ন প্রভৃতি পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। রূপকথা, অলৌকিক উপাদানে ভরপুর আর অদ্ভুত-আজগুবি বিষয় থাকলেও ত্রৈলোক্যনাথের গল্প বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৭), 'মুক্তমালা' (১৯০১)

‘মজার গল্প’ (১৯০৪), ‘ডমরুচরিত’ (১৯২৩) সংকলনের গল্পগুলির দ্বারা বাংলা গল্পের জগতে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কৌতূহলে পরিপূর্ণ। নরনারীর প্রেম ও সহজ সরল সুখ মানুষের নানা অভিলাষ ও সমাজে নানা সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত এবং এসবের সঙ্গে কৌতুক রস প্রভাতকুমারের গল্পের প্রধান আবেদন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পরশুরাম যেন ত্রৈলোক্যনাথের উত্তরসূরি ; শুধু উত্তরসূরি নয়, সার্থক উত্তরসূরি। রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম তির্যক বর্ণনাভঙ্গি ও অসাধারণ শব্দচয়নে যে গল্প জগৎ রচনা করেছেন তাতে উপন্যাস ছাড়াই বাংলা সাহিত্যের জগতে বসত আসন চিরস্থায়ী। উচ্চশিক্ষিত, মানবপ্রেমী ও যুক্তিবাদী এই তিন জনই ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন সমাজের ভুলভ্রান্তি ও সংস্কারাচ্ছন্ন দিকটিকে কোনও ভাবেই খাতির করেননি। তাই তাঁরা সমাজের নানা আচরণ, ভণ্ডামি ও অনাচারকে তীব্রভাবে কশাঘাত করেছেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর গল্প রচনায় পূর্বোক্তদের থেকে একটু ভিন্ন পথে হাঁটলেন। মানবদরদি এই কথাকার নিজের সহানুভূতির মিশ্রণে গ্রামসমাজের করুণ ও মর্মস্পর্শী বাস্তবকে তুলে ধরলেন তাঁর গল্পের মধ্যে। মূলত ‘ভারতবর্ষ’ ও ‘যমুনা’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ১৯১৩ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে তাঁর লেখা গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের জগতে চিরন্তন স্থান দখল করে আছে। শরৎচন্দ্রের গভীর সহানুভূতিতে বাঙালি জীবনের আনন্দময় ও বেদনাহত দিক স্থান পেয়েছে। একদিকে নরনারীর জটিল প্রেম ও অপরদিকে স্নেহ-বাৎসল্যে উজ্জ্বল তাঁর চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যে অমর।

একই সময়পর্বে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার প্রভাবিত বাংলা ছোটগল্প ধারায় ব্যতিক্রমী গল্প রচনার পথিকৃৎ হলেন প্রমথ চৌধুরী। গল্পের বিষয়, নির্মাণ কৌশল ও বর্ণনাভঙ্গী প্রায় সব কিছুতেই এক স্বতন্ত্র পথযাত্রায় গল্পকে তিনি নিয়ে যান। যুক্তিতে, তর্কে, সংলাপে প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবলের গল্প সমকালের প্রেক্ষিতে অভিনব। গল্পের বিষয় নির্বাচনে শুচিতাগ্রস্ত ভাব ভেঙে তাঁর ‘বীণাবাই’, ‘চার ইয়ারী কথা’-র মত গল্পগুলি নতুন ভাবনায় ভাবিত করে। প্রেমের মোহ, রোমান্টিকতা, যৌবনাবেগ সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কার ও পুরাতন ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে বাংলা গল্প জগৎকে এক নতুন পথের দিশা দেখায় এই গল্পগুলি। ছোটগল্পতে প্রবন্ধ সুলভ আবেদন আনার তকমা নিঃসন্দেহে প্রমথ চৌধুরীকে দিতে হয়। এই ভিন্ন বীরবলি ধাঁচে প্রবন্ধ সুলভ তর্ক, যুক্তি, কথকতার ঢঙ, সংলাপধর্মীতা, টীকাভাষ্য সংযোজনে, গল্প বয়ানরীতি প্রভৃতির দ্বারা বাংলা গল্প বিশেষভাবে পুষ্ট হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে পূর্বোক্ত ত্রৈলোক্যনাথের রচনার কিছুটা

মিল থাকলেও সূত্রাকার ও নিটোল গল্প-কথন, ভাষা সংযম, চরিত্র বিশ্লেষণ, মানব জীবন ও গল্প রস পরিবেশনায় প্রমথ চৌধুরী অনেকটাই এগিয়ে গেলেন।

এর পরে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুতে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক যাঁদের রচনাসম্ভার বিশ শতকের দুই ও তিন দশক থেকে এক বিস্তৃত সময়পর্বকে ফুলে ফলে বিকশিত করেছিল। এঁদের লেখায় সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত বাংলা গল্পের জগতকে ভিন্নতর বিষয়বস্তু ও বহু বিচিত্র উপাদানে পরিপূর্ণ করে। যদিও অনেকেই এই সময়কালীন লেখকদের দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী কথাকার রূপেও চিহ্নিত করেছেন। যদিও অনেকের রচনাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পরের কয়েক দশক ধরে প্রসারিত হয়েছিল। এই সময় জগতের মোড় ঘোরাতে এবং নতুন নতুন পথ দেখাতে সাহায্য করেছিল বেশ কিছু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ(১৯১৪-১৯১৮) রাশিয়ার বিপ্লব ১৯১৭, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ-এর ভয়াবহ রূপ এবং দেশীয় ক্ষেত্রে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক গান্ধীজির নেতৃত্বে, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত চলল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ভারতীয় জনজীবনে মার্ক্সবাদের প্রভাব, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ১৯২৭ ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব প্রভৃতি ঘটনাগুলি লেখক ও বুদ্ধিজীবী মহলকে নাড়া দিয়েছিল। ফলস্বরূপ বাংলার সাহিত্যের জগতেও এই সকল ঘটনার প্রভাব নিঃসন্দেহে অনিবার্য ছিল।

এই সময়কার অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকে গল্প রচনা শুরু করেছিলেন যে সকল লেখক তাঁদের নামগুলি তৎকালীন কিছু পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে দেখে নেওয়া যেতে পারে। ১৯২৩ সালে ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে উঠে আসেন বেশ কিছু লেখক যাঁর প্রধান তিন জন হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু। এছাড়াও ছিলেন প্রবোধকুমার সান্যাল, মণীশ ঘটক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ প্রমুখ। ‘প্রবাসী’, ‘শনিবারের চিঠি’, ‘বিচিত্রা’, ‘ভারতবর্ষ’ ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ প্রভৃতি পত্রিকায় দেখা দিলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিন বন্দোপাধ্যায় ছাড়াও এই সময়কালে ছিলেন আরও কয়েকজন প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক। তাঁরা হলেন -- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশাপূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও এই

সময়কালেরই লেখক, যদিও তাঁর সৃষ্টিসম্ভার পাঠকের সামনে আসে বিশ শতকের তিরিশের দশকের শেষ দিকে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আসার আগে তাঁর সমকালের কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যস্রষ্টার রচনাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু কথা অবশ্যই বলতে হয়। প্রমথ চৌধুরী আবহমান গল্পের ধারাতে কিছুটা ব্যতিক্রমী রচনার আস্বাদ আনলেও মূল ধাক্কাটি আনেন কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা। কল্লোল পর্বে ছোটগল্প ছিল মূলত সমাজ প্রেক্ষিত থেকে আসা। এই পরিবর্তনের অন্তরালে মূল হেতু ছিল প্রথম মহাযুদ্ধ, ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব। মহাযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে মূল্যবৃদ্ধি,খাদ্যাভাব, বেকারত্ব যে প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতি এবং এর পাশাপাশি মানবদেহে জৈব প্রবৃত্তির টান। মূলত এই বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কল্লোল গল্পের ভাবধারা। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক ভাবনার জগৎ থেকে কল্লোলের লেখকগণ একটি পৃথক পথে হাঁটলেন। এই পৃথক পথ তাঁদের এক রকম বিদ্রোহের প্রান্তরে উপস্থিত করে। যে পথে মধ্যবিত্তের একঘেয়ে জীবন, ফুটপাথ, সাঁওতাল পরগনা, চা-বাগানের রুক্ষ-বিধ্বস্ত মানবরূপ, কয়লাকুঠি দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসু নিজেই বলেছিলেন যে, কল্লোল যুগের মূল লক্ষ্যই ছিল বিদ্রোহ এবং সেই বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ। কল্লোলের লেখকগণ নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের বাস্তবতা ও পশ্চিমী সাহিত্যের ভাবধারাকে গল্পের মধ্যে অঙ্কন করেছিলেন ঠিকই তবে তাঁরা যে সব সময় সফল হয়েছিলেন সেটা বলা যায় না। কল্লোলের লেখকগণের গল্প-উপন্যাসে মূলত প্রকাশ পেয়েছে সংশয়, হতাশা, অবক্ষয়ের মনোভাব, রবীন্দ্র বিরোধিতা, যৌন উল্লাস, নগরভিত্তিক জীবনদৃষ্টি, দারিদ্র্যের আস্ফালন প্রভৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ মানুষের মূল্যবোধহীনতা ও অসহায়তা এবং মন্বন্তরের বিভীষিকাময় অবস্থা কল্লোল লেখকদের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন সংকীর্ণ নগরজীবনের রূপকার এবং মূলত মধ্যবিত্ত শহুরে জীবন থেকে তাঁর চরিত্রগুলো উঠে এসেছিল। অপরদিকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র নিম্ন-মধ্যবিত্তের দারিদ্র্যের পরাজয়কে বিষয় করে গল্প লেখা শুরু করেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘শুধু কেরানী’, ‘পুন্নাম-’; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘দুইবার রাজা’ এর প্রমাণ। তবে একটা বিষয় স্বীকার করতেই হবে যে কল্লোলীয়ানগণ যতই সমকালীন পরিস্থিতি নিয়ে বিদ্রোহের সুর তুলুন না কেন রোম্যান্টিকতার মোহে অবচেতনে হলেও জড়িয়ে পড়েছেন ঠিকই। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত নিজের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে, বস্তুত কল্লোল যুগে দুটি সুর প্রধান ছিল; এক, প্রবল বিরুদ্ধবাদ দুই, বিহ্বল ভাববিলাস।

কিছু কিছু কথাসাহিত্যিক কল্লোলের সমকালীন হয়েও অন্য কিছু পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাদের সাহিত্যরচনা তুলে ধরেছিলেন। এই পত্রিকাগুলি হল – ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’,

‘শনিবারের চিঠি’ ‘বিচিত্রা’, ‘আনন্দবাজার’ প্রভৃতি। এই সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই লেখকবৃন্দের মানসিকতা ও জীবনদর্শন ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। এই ভিন্ন প্রকৃতির লেখকবৃন্দের মধ্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একটি অন্যতম নাম। বাংলা কথাসাহিত্যের চিরন্তন দিকপাল তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় প্রথমে আসা যাক। এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত ছিলেন গ্রামজীবনের কথাশিল্পী এবং গ্রামজীবনের নাড়ীর সঙ্গে তাঁদের শিল্প-জীবনের যোগ কখনও ছিন্ন হয়নি। রবীন্দ্র-শরৎ উত্তর বাংলা গল্পক্ষেত্রে এঁনারাই প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। তারাশঙ্করের রচনায় একদিকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের রূপ অপরদিকে বর্ধিষ্ণু নব্য পুঁজিবাদের দম্ভ প্রকাশ পেয়েছে। অপরদিকে কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানবতাবাদী গ্রামীণ ও পল্লীজীবনের বাস্তব বিষয় ও প্রকৃতির সংস্পর্শে এক শাশ্বত জীবনের রূপকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বে প্রভাবিত হয়ে গল্প লিখেছিলেন। হয়তো এই কারণে সাহিত্যিক মহল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘কল্লোলের কুলবর্ধন’ অথবা ‘Belated Kallolean’ বলেছিলেন। কিন্তু ক্রমে মার্কসীয় সাম্যবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর বিশ্বাসী হয়ে সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে এই জীবন শিল্পী ধীরে ধীরে এক স্বতন্ত্র পথে হাঁটেন। যে পথে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও মধ্যবিত্তের ভণ্ডামি নেকামির বিরুদ্ধে রিক্ত-বঞ্চিত বাস্তব জীবনের কঠোর দুর্বিষহ চলাচল দেখা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জগদীশচন্দ্র গুপ্ত এবং সুবোধ ঘোষ জীবনকে দেখেছিলেন নির্বিকার পক্ষপাতশূন্য, নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে। যে দৃষ্টি কল্লোলীয়ানের রোমান্টিক যৌবন স্বপ্ন অথবা দারিদ্র্যের আস্ফালন নয়।

ইতঃপূর্বে আলোচ্য কল্লোল গোষ্ঠী এবং কল্লোল লেখকবৃন্দ বাদে সমকালে অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয় ও মূলত তৃতীয় দশকে লেখালেখি শুরু করেছিলেন, এমন কিছু কথাশিল্পী যাঁদের অবদান কোনও অংশে উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা সাহিত্যের গল্পজগতে এই সকল গল্পকারের সৃষ্টির অবদান চিরকালীন। হাস্যরস ও যথার্থ জীবনসত্যের আড়ালে মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষার রূপকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অলৌকিকতা ও ইতিহাসের আড়ালে অসাধারণ জীবনবার্তার রূপকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বিশী। বাংলা ছোটগল্পের জগতে বাংলার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বাইরের রূপ ধরা পড়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল ও শরদিন্দুর গল্পে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশাপূর্ণা দেবীর মত বাঙালি পারিবারিক জীবনের রূপকার পাওয়া দুর্লভ। বিশুদ্ধ রোমান্স, মনোগহনের আলো-আঁধারি পরিবেশ, জীবনের জটিলতা ও বিশুদ্ধ প্রেম লক্ষ করা যায় মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র,

ভবানী মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুমথনাথ ঘোষ প্রমুখের গল্পে। শুধু গল্পের জগতে নয়, এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সব্যসাচী লেখক। প্রচুর জীবনাভিজ্ঞতা, উদার জীবনদৃষ্টি, প্রবল কল্পনাশক্তি ছিল এই সকল কথাকারদের প্রধান মূলধন।

বাংলা ছোটগল্পের একটা ক্রমবর্ধমান ধারার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এ পর্যন্ত আলোচনা করা হল এবং সেই সঙ্গে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যাকাশে আবির্ভাব সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া হল। এবার আমার গবেষণাকর্মের মূল স্বরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। আমার গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম – "বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে জীবন বৈচিত্র্যের রূপ ও রূপান্তরের অন্বেষণ"। এই শিরোনামকে আধার করেই আমার গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে বিষয় বিভাজন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জীবন বৈচিত্র্য বলতে বোঝানো হচ্ছে জীবনের যে বিচিত্র রূপ অর্থাৎ কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যময় জীবনের রূপকেই সাহিত্যের পাতায় ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু জীবন কখনোই নিস্তরঙ্গ ভাবে একই ধারায় বয়ে চলে না। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব ও নানান বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সবসময় জীবনকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই জীবনের এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর ঘটে চলে। ছোটগল্প এমন একটি সাহিত্য প্রকরণ যেখানে স্বল্প পরিসরে জীবনের খণ্ডাংশ প্রকাশ হয়। লেখকের অভিজ্ঞতাজাত চরিত্রগুলিও গল্পের শুরু এবং শেষে তাঁদের অবস্থার পার্থক্যের পরিচয় তুলে ধরেন। জীবনের এই এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর অবশ্যই আলোচনা ও বিশ্লেষণের একটি বিশেষ দিক।

আবার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজনের দিক থেকেও জীবনের রূপ ও রূপান্তরের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের ক্রমবর্ধমান ধারায় বিশেষ কতগুলি পর্যায় স্থূলভাবে লক্ষিত হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক সম্পূর্ণ মানব জীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের পর্যায়গুলি স্বাভাবিকভাবে সকলের চোখে পড়ে। নির্দিষ্ট সীমারেখার দ্বারা এই পর্যায়েগুলিকে বিভক্ত না করা গেলেও বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে এই পর্যায় গুলিকে অবশ্যই চিহ্নিত করা যায়। গল্পের বিষয়গত আলোচনায় মানবজীবনের এই পর্যায়গুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের বিষয়বস্তুও এই আলোচনাকে অগ্রসর হতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ভূমিকা ও উপসংহার বাদে আমার গবেষণা প্রকল্পটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে -- প্রথম অধ্যায় - বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকৃতি, দ্বিতীয় অধ্যায় - বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পভুবনের পরিচয় সংক্ষেপ, তৃতীয় অধ্যায় -

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে শিশু ও কিশোর জীবনের রূপ ও রূপান্তরের অন্বেষণ, চতুর্থ অধ্যায় – বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে নরনারীর প্রেমের সম্পর্কের রূপ ও রূপান্তর অন্বেষণ, পঞ্চম অধ্যায় – বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক গল্পে জীবন বৈচিত্র্যের রূপ ও রূপান্তরের অন্বেষণ। প্রত্যেক গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে একটি বিশেষ সময়ের রূপ ফুটে উঠেছে এবং গল্পের ক্রমিক ঘটনা, পরিস্থিতির কারণে সেগুলি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। ক্রম অনুযায়ী পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচনা এবং গল্প বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পসত্তা তুলে ধরাই এই গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য।